ভূমিকা

সমাজ-জীবনের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করলে ধরা পড়ে নারীর একটি মুখ যা সর্বোতভাবে পুরুষের অভিমুখী। কিন্তু এই অভিমুখীনতা যদি নারীর প্রাপ্তির সীমানাকে ব্যপ্ত করতে পারত তবে তা অভিনন্দিত হতে পারত। কিন্তু নারীর এই নির্ভরতার মাঝেই কৌশলে পুরুষতন্ত্র নারীকে করেছে দুর্বল এবং তাকে নিয়ে গিয়েছে শোষণের কেন্দ্রস্থলে। সামাজিক দিক থেকে ভারতীয় নারীর স্থান প্রায় দেবত্বের পর্যায়ে এমন একটি ভ্রান্ত ধারণা যুগ যুগ ধরে সযত্নে লালিত হয়ে আসছে। কিন্তু বাস্তবে নারী ব্যক্তি হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে নয়, নারী শ্রেণী হিসেবে বিবেচ্য। বলাই বাহুল্য, এই শ্রেণী লিঙ্গ বিভাজিত শোষিত শ্রেণী। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই পাশ্চাত্যে ভাঙ্গাগড়ার নূতন ইতিহাস রচিত হয়েছে। শিল্প বিপ্লব (১৭৬০), ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯), দাসপ্রথার অবসান (১৭৯০), মেরী ওলস্টন ক্রাফটের নারীর অধিকার সংক্রান্ত গ্রন্থ (১৭৯২), সেনেকা ফলস্-এর ইস্তাহার (১৮৪৮), ক্লারা জেটলিনের (১৮৫৭-১৯৩৩) নেতৃত্বে সমাজতাত্ত্বিক নারী আন্দোলন এবং ৮ই মার্চ নারী দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তনশীল নূতন ইতিহাস রচিত হয়েছিল যার প্রভাব বহুদূর প্রসারী হলেও ভারতবর্ষে তার তেমন প্রভাব পড়ে নি। আর পড়ে নি বলেই মধ্যযুগীয় বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ইংরেজ আগমন ও তারই অনুষঙ্গ হিসেবে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার পর্যন্ত। অনালোকিত অন্তঃপুরে রোদনভরা নারী জীবনের স্তরে স্তরে জমেছিল যন্ত্রণা। ইংরেজী শিক্ষা সমাদৃত হলে ভারতবর্ষীয় পুরুষ সম্প্রদায়ের দৃষ্টির প্রসারতা দেখা দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে সংস্কার আন্দোলনগুলির সূচনা। সতীদাহ প্রথা নিবারণ (১৮২৯), বিধবাবিবাহ আইন (১৮৫৬), সহবাস সম্মতি আইন (১৮৯১) এইগুলি তৎকালীন সমাজে নারীর দুর্দশা মোচনে সহায়তা দান করে। স্কুল স্থাপন ও সংস্কার আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীকে নবজাগরণের দ্বারপ্রান্তে এনে দিয়েছিল। এইসব কর্মসূচী সামাজিক পরিস্থিতির পট পরিবর্তন করতে লাগল। কিন্তু বাইরের ধ্বনিমুখর ও পরিবর্তনশীল যে ইতিহাস রচিত হচ্ছিল স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালে সেখানে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছিল সামান্যই। সেই অতি সামান্য সংখ্যক নারীর শিক্ষা, সাহিত্য-সৃজন, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা, সভাসমিতি স্থাপন, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, নানা আন্দোলনে অংশীদার হওয়ার মধ্য দিয়ে নারীর বহুমুখী

সাংস্কৃতিক নির্মাণ শুরু হল। আজকের নারীর পূর্বসূরী যাঁরা, তাঁদের সংসারে মৌন অবস্থান ও অব্যক্ত বেদনায় সিক্ত যে জীবন, তাকে স্মরণ করেই নারী প্রগতির ইতিহাস রচিত হল। সেই নারী প্রগতির ইতিহাস অনাম্নী অঙ্গনাদের রক্তক্ষরণের ইতিহাস। সেই যন্ত্রণা আর অবহেলার মধ্যে শুধু মানুষের অধিকারটুকু পাবার জন্য একটু সমমর্মিতা, একটু ভালবাসার জন্য, পুরুষের পাশে বিবর্ণ নারী মুখগুলির একটু উজ্জ্বলতার জন্য, নীরবে মুখ বুজে অন্যায়, অবিচার সহ্য করেও সংগ্রামী পথে হেঁটে চলেছে পদাতিক নারী। তার সেই যাত্রার লক্ষ্য নারী পুরুষের সম অধিকার। চেতনার বিদ্রোহে, প্রতিবাদে ও প্রগতিশীলতায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে এক অখণ্ড মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে চাইল নারী। যা তার জন্মগত অধিকার, যা তার মৌলিক অধিকার তাকে আদায় করতে শিখল নারী। এই ধারাতেই মুসলিম সমাজে এমন এক মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেনের সংগ্রামের ইতিহাস পেলাম, যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের মানুষ হয়েও মুসলিম সমাজে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। মুখ বুজে অবরোধবন্দিনী থাকা নারীর এই আর্কিটাইপ নির্মাণকে তিনি ভেঙ্গে দিলেন। বিবেকহীন লিঙ্গ বৈষম্যকে তিনি বারবার যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করলেন। নারীমুক্তির জন্য নিবেদিতপ্রাণ বেগম রোকেয়া ভবিষ্যৎ স্রষ্টার মত এক নারীস্থান (সুলতানার স্বপ্ন) নির্মাণ করলেন। এমন যে বলিষ্ঠ নারী তাঁর যুগে, তাঁর সমাজের বাধা অতিক্রম করে শুধু মুসলিম সমাজেই নয়, বৃহত্তর নারী সমাজের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন তাঁকে আরও গভীরভাবে জানার আগ্রহ থেকেই এই গবেষণা কর্মের পরিকল্পনা। তাঁকে নিয়ে কাজ হয়েছে খুবই কম। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমার এই গবেষণা কর্মটিই প্রথম বেগম রোকেয়ার প্রতি আলোকপাত। রোকেয়ার জীবনের সময়সীমা ১৮৮০-১৯৩২ সাল। তাঁর সাহিত্য-কর্ম যে সব সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির অনেকগুলিই পরবর্তীকালে যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে বিনষ্টির পথে বা প্রকাশের ধারা ব্যাহত হয়েছে। এই মহীয়সী নারী তাঁর সংগ্রামী জীবনের কথা কোথাও সেভাবে লিখে যান নি। তাঁর সময়কালের অন্যান্য লেখিকাদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহের অসুবিধে রয়েছে।

আমার এই গবেষণা কার্যটির তত্ত্বাবধায়িকা হলেন প্রফেসর (ড.) মঞ্জুলা বেরা, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। আমার কলেজে মানবী বিদ্যাচর্চা (Women's Studies) বিভাগের একটি কার্যক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এবং

সেখান থেকে গবেষণার প্রেরণা আমায় প্রাণিত করেছে। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, নানা সময়ে নানারকম পরামর্শ, পথ নির্দেশ ও ঐকান্তিক সহযোগিতার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এই গবেষণা কর্মে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী, কোচবিহার ও বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি মানবী বিদ্যাচর্চা বিভাগ, ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে'র প্রধানা শিক্ষিকা শ্রীমতী পম্পা নাগের (সিংহ মহাপাত্র) কিছু আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়েছি। বেগম রোকেয়ার দাম্পত্য জীবনের চিত্র ও প্রধানা শিক্ষিকাদের তালিকাটি তাঁরই সাহায্যে প্রাপ্ত। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ভ্রাতৃপ্রতিম ড. প্রহ্লাদ দেব নানা সময় সেমিনারের কাজে বাংলাদেশে গিয়েছেন এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ এনে দিয়ে আমার কাজে সহায়তা করেছেন। আমার চিকিৎসক স্বামী ডা: পীযুষ কুমার দাস ও আমার বোন শ্রীমতী শিখা মজুমদারের অনুপ্রেরণার কথা বলতেই হয়। যার কথা বারবার বললেও সবটুকু বলা হয় না সে হল আমার একমাত্র কন্যা, যে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রী, শ্রীমতী স্বাতীলেখা দাস। আমার এই গবেষণা কর্মে এগিয়ে আসার সবচেয়ে বড় প্রেরণা সে এবং মানবী বিদ্যাচর্চা বিভাগের আমার ছাত্রীরা। আন্তর্জালিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বেগম রোকেয়াকে কেন্দ্র করে নানা কর্মযজ্ঞের ছবি সংগ্রহ করে সহায়তা করেছে আমার কন্যা। আমার উজাড় করা মাতৃস্নেহে ওকে সিক্ত করা ছাড়া আর কি আমি করতে পারি। আরবী-ফারসী শব্দগুলির অর্থ উদ্ধারে সহায়তা করেছেন মৌলানা আব্দুল বারি ও মুফতী মেহেবুব আলম খোন্দকার এবং কোচবিহারের নূতন মসজিদের লাইব্রেরী ব্যবহারে সহায়তা করেছেন ইন্তেজার আহমেদ। এঁদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবশেষে বলি আমার এই পরিশ্রম তখনই সার্থক হবে যখন তা গুণীজনের সমাদর লাভ করবে। আমার এই গবেষণা কর্মের মধ্যে অগ্নিকন্যার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ রইল যিনি পরশুর, আজকের ও আগামীকালের প্রগতিশীল নারী ভাবনার অগ্রদূত।

গোপা মজুমদার (দাস)

মে দিবস, ২০১১

গোপা মজুমদার (দাস)